দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ১

শিক্ষার্থীদের দৈনিক রুটিন ও কিছু দীর্ঘশ্বাস

আনোয়ার জাহান

স্কুলের পুরনো স্যারদের ছাড়া অন্য স্যারদের পড়ানো কদাচিৎ বোঝা যেত। এখন অবশ্য মাঝে মাঝে মনে হয় ইচ্ছা করেই কী তারা বোঝাতে চান না ক্লাসে? অনেক বন্ধুকে মার খেতে দেখেছি। শুনেছি কোনো একজন নির্দিষ্ট স্যারের কাছে প্রাইভেট না পড়ার জন্যই এ শাস্তি। স্কুলের স্যারকে দেখেছি দুর্নীতির দায়ে স্কুল থেকে বহিষ্কার হতে। আবার বের হয়ে যাবার পর সেই স্যারকেই দেখেছি প্রধানশিক্ষক হতে

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছর পার করে এখন চতুর্থ বর্ষে। এই তিন বছরে বিভিন্ন সময়ে নিজের হাতখরচ ও অন্যান্য খরচের জন্য টিউশনি করতে হয়েছে। কিছুদিন আগে একটা নতুন টিউশনি শুরু করতে গিয়েই এই লেখাটা লেখার কথা মাথায় এলো।

টিউশনি শুরুর প্রথম দিনে সাধারণত পড়ালেখা শুরু করা হয় না। পরিচয় পর্বতেই শেষ হয়। আমি অবাক হয়ে এতদিন ধরে লক্ষ করলাম এই পরিচয়পর্বে আমার প্রত্যেকটা ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে শোনা দৈনিক রুটিনটা যেন একই রকম! এমনকি তাদের কিছু আচরণেও দেখি অদ্ভুত রকমের মিল।

কিছু প্রশ্নোত্তর শুনলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করি। প্রথম প্রথম একজন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা কঠিন। তাই প্রথমেই যখন বলি—'তোমার কথা বলো। যা ইচ্ছে হয়। আজকে কোনো পড়ালেখা হবে না।'— আমার কথা শুনে ছাত্র-ছাত্রীরা কেমন একটা থতমত খেয়ে যায়। যেন কত কঠিন কিছু একটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তারা বলার কিছু খুঁজে পায় না! অভয় দেই—'লজ্জা পাবার কিছু নেই। যা মনে আসে বলতে পারো, যা প্রশ্ন আসে করতে পারো।' এরপরও তারা ভাবতে থাকে। কিছু বলার মতো কিছু খুঁজে পায় না। অবাক হয়ে ভাবি কিশোরবয়সী একটা ছেলে বা মেয়ের কিছু বলার নেই তা কি হতে পারে! হয়ত সংকোচ বোধ করছে।

সহজ হতে প্রশ্ন করি— 'আচ্ছা, পড়ালেখা ছাড়া কী করা হয়? কিংবা কী করতে ভালো লাগে?' বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উত্তর আসে—'কিছুই না! গেমস খেলতে! টিভি দেখতে!'। 'কিছুই না' উত্তরটা বেশ অবাক করার মতো। আবার প্রশ্ন করতে হয়—'কিছু তো কর অবশ্যই। আঁকাআঁকি, বইপড়া, খেলাধুলা...'। শেষজন উত্তর দিয়েছিল— 'ড্রয়িং করতে ভালো লাগে।' কী ড্রয়িং করো দেখাতে বললে বলে—'এখন আর করি না। আগে করতাম'। অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্রীর এমন কী হতে পারে যার জন্য তার এখন আর ছবি আঁকাই হয় না! গেমস এর কথা বলেছিল এক ছাত্র। বেশ আগ্রহ তার এতে। বিভিন্ন গেমস আর নামিদামি অনেক গাড়ির নাম জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু আড্ডাটা ঠিক সেদিকে জমে না।

'বই পড়া হয়?' 'হ্যাঁ হয়।' 'গল্পের বই?' 'ও। হ্যাঁ। কয়েকটা পড়েছি।' 'কার কার?' বর্তমান সময়ের একজন কিংবা দুইজন জনপ্রিয় লেখকের নাম উঠে আসে। কী গল্প? সায়েন্স ফিকশন? 'হুম অমনই। কিছু গল্প আছে এত অদ্ভুত!'

কিছুটা সহজ হয়ে আসে ওরা এ পর্যায়ে। জিজ্ঞাসা করি— 'কী পড়তে ভালো লাগে?' 'কিছুই না!' সত্যিকার অর্থে এমন উত্তর আমি পেয়েছি। ধরে ধরে কোনো একটা বিষয় কেমন লাগে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত আলতো করে মাথা নাড়ে। কিন্তু তা থেকে বোঝা যায়, পড়ালেখার জগৎ নিয়ে যেন তাদের বিতৃষ্ণার সীমা নেই।

এরপর জিজ্ঞেস করি— 'আচ্ছা বললে যে পড়ালেখা ছাড়া কিছু করা না তাহলে কী কর সারাদিন?' শেষ ছাত্রীর রুটিনটা ছিল এমন—'সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ক্লাসে থাকি। সাড়ে ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত কোচিং-এ। এরপর সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৮টায় বাসায় স্যার এসে পড়ান।'

বাংলা, ইংরেজির জন্য তার স্কুলের স্যারের কাছে পড়ে। অংক বাসায় একজনের কাছে পড়ে। আমাকে রাখা হয়েছে বিজ্ঞান ও আইসিটি পড়ানোর জন্য। এছাড়াও সাপ্তাহিক ছুটির একদিন শুক্রবারেও সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত একটি কোচিং-এ তাকে দিতে হয় পরীক্ষা। এছাড়াও তার সঙ্গে রয়েছে কোরআন শিক্ষার জন্য একজন হুজুর। রুটিনটা শুনে মাথা ঘুরতে থাকে। 'তারপর রাতে কী কর?' উত্তরে আসে—'বাড়ির কাজ (হোমওয়ার্ক)'। ঘুমাও কখন? 'রাত ১১টা বা সাড়ে ১১টা।' 'ওঠো কয়টায়? ৭টায়?' 'না সাড়ে ছয়টায়।'

এমন রুটিন আমার প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরই রয়েছে। আমি তিনদিন পড়াই সাধারণত। এই তিনদিন সময় করতেই তাদের রুটিনের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়!

স্কুলে এতটা সময় কাটায় ভেবে প্রশ্ন করি— 'স্কুলে কী কর'? কিছুই করি না। গল্প করি— বন্ধুদের সঙ্গে। 'টিফিন টাইমে'? এক দুইজন (ছেলে) খেলাধুলা করার কথা বললেও অন্যরা সেসময়েও নিষ্ক্রিয়। কেন? জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসে—'মাঠ নেই। কিংবা থাকলেও খেলার সুযোগ নেই।'

শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথোপকথনগুলো আরো হতাশাজনক। 'চাচা/চাচি, এতগুলো স্যার না দিয়ে ওকে নিজে পড়ার একটু সময় দেন।' কেমন যেন আমতা আমতা করেন এ সময় সবাই। 'বাবা স্কুলে কিছু পড়ায় না। এখন যদি কোচিংএ না পড়াই তাহলে কীভাবে পরীক্ষা দেবে? আমরাও তো সময় দিতে পারি না।' তাদের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখে বলি—'আপনাদের দুশ্চিন্তা ছেলেমেয়ের উপর গিয়ে পড়ে। এতে ও ঠিকমত নাও পড়তে পারে।' এ কথা ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ঐ শিক্ষার্থীর উপরই—'আমাদের দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই শুনলে তো, তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে। ঐ অমুককে দেখ, অমুকের মেয়ে দেখ— নিজ থেকে কত সিরিয়াস! আর তুমি?' এতক্ষণ ছাত্র-ছাত্রী যতটা না সহজ হয়েছিল বাবা-মার সামনে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যেতে থাকে এবার।

যখন বলি— 'সমস্যা নেই, তোমাকে ওর মতো হতে হবে এমন কথা নেই। একেকজন একেকটাতে ভালো।' তারা একটা কষ্টের হাসি দেয়। মনে হয় যেন কোনো মিথ্যে আশ্বাস শুনছে।

'এতগুলো কোচিং/ স্যার না দিয়ে আপনারা ছুটির দিন ওর সঙ্গে একটু সময় কাটাতে পারেন।' এসময় অভিভাবকেরা একটা অপরাধবোধ নিয়ে হাসি দেন। বলেন, 'প্রথম থেকে কোচিংএ না দিলে বাবা পরে পিছিয়ে পড়ে।' আমি এই কথাগুলো দুইবছর একজন অভিভাবককে বলার পরও শিক্ষকের সংখ্যা তেমন কমেনি।

এসব শিক্ষার্থী প্রত্যেকেই ঢাকা শহরের বিখ্যাত বলে খ্যাত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। এদের অভিভাবকেরা মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চ মধ্যবিত্ত। তাদের মাসিক আয়ের একটা বিশাল অংশ চলে যায় সন্তানের পড়ালেখার পেছনে। এত টাকা খরচ করে তারা ভালো ফলাফল চায়। তারা আপস করতে রাজি নন। দরকার হলে আরো কোচিং-এর ব্যবস্থাও করতে তারা রাজি।

অথচ তাদের শৈশবের কথা জিজ্ঞেস করলে বলেন— 'আমাদের স্কুলে তো ছিল বিশাল মাঠ, আরে আমরা কত শয়তানি করতাম ছোটবেলায়, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম, আচার চুরি করতাম, সিনেমা দেখতে চলে যেতাম— আরো কত কী!' বলতে গিয়ে তাদের মুখে আর চোখে যে একরাশ আনন্দের ছোঁয়া চলে এসেছে তা আমি আর আমার ছাত্র-ছাত্রী দেখতে পেতাম। আর এ দেখে ভাবি— 'তাহলে নিজেদের ছেলেমেয়েকেই কেন তারা পুরো উল্টোপথে যেতে বাধ্য করছেন?'

আমি নিজেও এমন একটি স্বনামধন্য স্কুলে পড়ালেখা করেছি। এ স্কুলে মাঠ ছিল। কিন্তু মাঠে খেলা হতো না। টিফিনের সময় ছিল কিন্তু সে সময়ে নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক ছিল। স্কুল ছিল। বিভিন্ন দিবস ছিল। কোনো দিবস পালিত হতো না। স্কুলের ড্রেস হিসেবে এমন এক পোশাক ছিল যা সারাদিন পরে থাকলে বিকেলে মাথার চুল ব্যথায় টনটন করত। স্কুলে ক্লাব ছিল। ক্লাবে তেমন কোনো কাজ হতো না। গ্রন্থাগার ছিল। গ্রন্থাগারে যাবার সময় ছিল না।

স্কুলের পুরনো স্যারদের ছাড়া অন্য স্যারদের পড়ানো কদাচিৎ বোঝা যেত। এখন অবশ্য মাঝে মাঝে মনে হয় ইচ্ছা করেই কী তারা বোঝাতে চান না ক্লাসে? অনেক বন্ধুকে মার খেতে দেখেছি। শুনেছি কোনো একজন নির্দিষ্ট স্যারের কাছে প্রাইভেট না পড়ার জন্যই এ শাস্তি। স্কুলের স্যারকে দেখেছি দুর্নীতির দায়ে স্কুল থেকে বহিষ্কার হতে। আবার বের হয়ে যাবার পর সেই স্যারকেই দেখেছি প্রধান শিক্ষক হতে।

আগের দিনের মানুষদের শৈশবের কথা যখন শুনি আর নিজেরটা কিংবা নিজের ছাত্র-ছাত্রীদেরটা ভাবি তখন কেবল আসে দিনরাত স্কুল ও কোচিং-এর দুর্বিষহ স্মৃতির যন্ত্রণা, কম্পিউটার গেমস-এর কথা আর দুই-একবার সৌভাগ্যক্রমে মাঠে খেলতে যাওয়ার কথা। এমনই এক নষ্ট শৈশবের স্মৃতি দিন দিন আরো প্রকট হতে দেখি নতুনদের মাঝে।

● লেখক : শিক্ষার্থী, ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়